ব্রাউন সাহেবের বাড়ি

ব্রাউন সাহেবের ডায়রিটি হাতে আসার পর থেকেই ব্যাঙ্গালোর যাবার একটা সুযোগ খুঁজছিলাম। সেটা এল বেশ অপ্রত্যাশিত ভাবে। আমাদের বালিগঞ্জ স্কুলের বাৎসরিক রি-ইউনিয়নে দেখা হয়ে গেল আমার পুরনো সহপাঠী অনীকেন্দ্র ভৌমিকের সঙ্গে। অনীক বলল সে ব্যাঙ্গালোরে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সে চাকরি করছে। 'একবার ঘুরে যা না এসে আমার ওখানে। দ্য বেস্ট প্লেস ইন ইন্ডিয়া! একটা বাড়তি ঘরও আছে আমার বাড়িতে। আসবি?'

অনীক স্কুলে থাকতে আমার খুবই বন্ধু ছিল। তারপর যা হয় আর কী। কলেজ হয়ে গেল দু'জনের আলাদা। তা ছাড়া ও বিজ্ঞান আর আমি আর্টস। দু'জনে প্রায় উলটোমুখো রাস্তা ধরে চলতে আরম্ভ করলাম। মাঝে ও আবার চলে গেল বিলেতে। ফলে ক্রমে দু'জনের বন্ধুত্বের মধ্যেও অনেকটা ব্যবধান এসে পড়ল। আর আজ প্রায় বারো বছর পর তার সঙ্গে দেখা। বললাম, 'গিয়ে পড়তে পারি। কোন সময়টা ভাল?'

'এনি টাইম। ব্যাঙ্গালোরে গরম নেই। সাধে কি জায়গাটা সাহেবদের এত প্রিয়? তুই যখনই আসতে চাস আসিস। তবে সাতদিনের নোটিশ পেলে ভাল হয়।'

যাক, তা হলে ব্রাউন সাহেবের বাড়িটা দেখার সৌভাগ্য হলেও হতে পারে। কিন্তু তার আগে সাহেবের ডায়রিটার কথা বলা দরকার।

আমি হলাম যাকে বলে পুরনো বইয়ের পোকা। ব্যাঙ্কে কাজ করে প্রতি মাসে যা রোজগার হয়, তার অন্তত অর্ধেক টাকা পুরনো বই কেনার পিছনে খরচ হয়। ভ্রমণকাহিনী, শিকারের গল্প, ইতিহাস, আত্মজীবনী, ডায়রি—কতরকম বই না গত পাঁচ বছরে জমে উঠেছে আমার। পোকায় কাটা পাতা, বার্ধক্যে ঝুরঝুরে হয়ে যাওয়া পাতা, ড্যাম্পে বিবর্ণ হওয়া পাতা—এসবই আমার কাছে অতি পরিচিত এবং অতি প্রিয় জিনিস। আর পুরনো বইয়ের গন্ধ—এর জুড়ি নেই। অগুরু কস্তুরী গোলাপ হাসনুহানা—মায় ফরাসি সেরা পারফিউমের সুবাস এই দুটো গন্ধর কাছে হার মেনে যায়।

এই পুরনো বই কেনাই আমার একমাত্র নেশা, আর পুরনো বই কিনতে গিয়েই পাওয়া ব্রাউন সাহেবের ডায়রিটা। বলে রাখি এ ডায়রি কিন্তু ছাপা ডায়রি নয়—যদিও সেরকম ডায়রিও আমার আছে। এ ডায়রি একেবারে খাগের কলমে লেখা আসল ডায়রি। লাল চামড়ায় বাঁধানো সাড়ে তিনশো পাতার রুলটানা খাতা। ছ' ইঞ্চি বাই সাড়ে চার ইঞ্চি। মলাটের চারপাশে সোনার জলের নকশা করা বর্ডার, তার

মাঝখানে সোনার ছাপার অক্ষরে লেখা সাহেবের নাম—জন মিডলটন ব্রাউন। মলাট খুললে প্রথম পাতায় সাহেবের নিজের হাতে নাম সই, তার নীচে সাহেবের ঠিকানা—এভারগ্রিন লজ, ফ্রেজার টাউন, ব্যাঙ্গালোর—আর তার নীচে লেখা—জানুয়ারি, ১৮৫৮। অর্থাৎ এ ডায়রির বয়স হল একশো তেরো। এই ব্রাউন সাহেবের নাম লেখা অন্য আরো খানকতক বইয়ের সঙ্গে ছিল এই লাল চামড়ায় বাঁধানো খাতাটা। নামকরা বইয়ের তুলনায় দাম খুবই কম। মকবুল চাইল কুড়ি, আমি বললাম দশ, শেষটায় বারো টাকার বিনিময়ে বইটা আমার সম্পত্তি হয়ে গেল। ব্রাউন যদি নামকরা কেউ হতেন তা হলে এই বইয়ের দাম হাজার টাকা হতে পারত।

ডায়রিটাতে তখনকার দিনের ভারতবর্ষে সাহেবদের দৈনন্দিন জীবনের বাইরে আর কিছু জানতে পাব এমন আশা করিনি। সত্যি বলতে কী, প্রথম শ'খানেক পাতা পড়ে তার বেশি পাইওনি। ব্রাউন সাহেবের পেশা ছিল ইস্কুলমাস্টারি। ব্যাঙ্গালোরের কোনও একটা স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। সাহেব নিজের কথাই বেশি বলেছেন; মাঝে মাঝে ব্যাঙ্গালোর শহরের বর্ণনা করেছেন। এক জায়গায় তখনকার বড়লাটের গিন্নি লেডি ক্যানিং-এর ব্যাঙ্গালোর আসার ঘটনা বলেছেন, ব্যাঙ্গালোরের ফুল ফল গাছপালা ও তাঁর নিজের বাগানের কথা বলেছেন। এক এক জায়গায় আবার ইংল্যান্ডের সাসেক্স অঞ্চলে তাঁর পৈতৃক বাড়ি, আর তাঁর পিছনে-ফেলে আসা আত্মীয়স্বজনের কথা বলেছেন। তাঁর স্ত্রী এলিজাবেথের উল্লেখও আছে, তবে স্ত্রীটি কয়েক বছর আগেই মারা গিয়েছিলেন।

সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে সাইমন নামে কোনও এক ব্যক্তির বারংবার উল্লেখ। এই সাইমন যে কে ছিলেন—তাঁর ছেলে না ভাই না ভাগ্নে না বন্ধু না কি—সেটা বোঝার কোনও উপায় ডায়রিতে নেই। তবে সাইমনের প্রতি ব্রাউন সাহেবের যে একটা গভীর টান ছিল সেটা বুঝতে কোনও অসুবিধা হয় না। সাইমনের বুদ্ধি, সাইমনের সাহস, সাইমনের রাগ অভিমান দুষ্টুমি খামখেয়ালিপনা ইত্যাদির কথা বারবার আছে ডায়রিতে। সাইমন অমুক চেয়ারটায় বসতে ভালবাসে, আজ সাইমনের শরীরটা ভাল নেই, সাইমনকে আজ সারাদিন দেখতে পাইনি বলে মনখারাপ—এই ধরনের সব খুঁটিনাটি খবরও আছে। আর আছে সাইমনের মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর। ২২শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ বজ্রাঘাতে সাইমনের মৃত্যু হয়। পরের দিন ভোরবেলা ব্রাউন সাহেবের বাগানে একটা বাজে ঝলসে যাওয়া ইউক্যালিপটাস গাছের পাশে সাইমনের মৃতদেহ পাওয়া যায়।

এর পর থেকে একটা মাস ডায়রিতে প্রায় আর কিছুই লেখা হয়নি। যেটুকু হয়েছে তার মধ্যে শোক আর হতাশার কথা ছাড়া আর কিছু নেই। ব্রাউন সাহেব দেশে ফিরে যাবার কথা ভাবেছেন—কিন্তু সাইমনের আত্মা থেকে দূরে সরে যেতে তাঁর মন চায়নি। সাহেবের স্বাস্থ্যও যেন অল্প অল্প ভেঙে পড়েছে। 'আজও স্কুলে গেলাম না' কথাটা পাঁচ জায়গায় বলা হয়েছে। লুকাস বলে একজন ডাক্তারের উল্লেখও আছে। তিনি ব্রাউন সাহেবকে পরীক্ষা করে ওষুধ বাতলে গেছেন।

তারপর হঠাৎ—২রা নভেম্বর—ডায়রিতে এক আশ্চর্য ঘটনার উল্লেখ; এবং এই

ঘটনাই আমরা কাছে ডায়রির মূল্য হাজার গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। ব্রাউন সাহেব এ ঘটনাটা লিখেছেন রোজকার নীলের বদলে লাল কালিতে। তাতে বলছেন (আমি বাংলায় অনুবাদ করছি)—'আজ এক অভাবনীয় আশ্চর্য ঘটনা! আমি বিকালে লালবাগে গিয়েছিলাম গাছপালার সান্নিধ্যে আমার মনটাকে একটু শান্ত করার জন্য। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ বাড়ি ফিরে বৈঠকখানায় ঢুকেই দেখি—সাইমন ফায়ারপ্লেসের পাশে তার প্রিয় হাই-ব্যাকড চেয়ারটিতে বসে আছে। সাইমন! সত্যিই সাইমন! আমি তো দেখে আনন্দে আত্মহারা। আর শুধু যে বসে আছে তা নয়—সে একদৃষ্টে আমারই দিকে তাকিয়ে আছে তার স্নেহমাখানো চোখ দুটি দিয়ে। এদিকে ঘরে বাতি নেই। আমার ফাঁকিবাজ খানসামা টমাস এখনও ল্যাম্প জ্বালেনি। তাই সাইমনকে আরেকটু ভাল করে দেখব বলে আমি পকেট থেকে দেশলাইটা বার করলাম। কাঠি বার করে বাক্সের গায়ে ঘষতেই আলো জ্বলে উঠল—কিন্তু কী আফসোস! এই কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সাইমন উধাও! অবিশ্যি সাইমনকে যে কোনওদিন আবার দেখতে পাব সেটাই তো আশা করিনি! এইভাবে ভূত অবস্থাতেও যদি মাঝে মাঝে সে দেখা দিয়ে যায়, তা হলে আমার মন থেকে সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে। সত্যি আজ এক অপূর্ব আনন্দের দিন। সাইমন মরে গিয়েও আমাকে ভোলেনি; এমনকী তার প্রিয় চেয়ারটিকেও সে ভোলেনি। দোহাই সাইমন—মাঝে মাঝে দেখা দিও—আর কিছু চাই না আমি তোমার কাছে। এইটুকু পেলেই আমি বাকি জীবনটা শান্তিতে কাটাতে পারব।'

এর পরে ডায়রি আর বেশিদিন চলেনি। যেটুকু আছে তার মধ্যে কোনও দুঃখের ছাপ নেই, কারণ সাইমনের সঙ্গে ব্রাউন সাহেবের প্রতিদিনই একবার করে দেখা হয়েছে। সাইমনের ভূত সাহেবকে হতাশ করেনি।

ডায়রির শেষ পাতায় লেখা আছে—'যে আমাকে ভালবাসে, তার মৃত্যুর পরেও যে তার সে-ভালবাসা অটুট থাকে, এই জ্ঞান লাভ করে আমি পরম শান্তি পেয়েছি।'

ব্যস্—এই শেষ। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে—ব্রাউন সাহেবের এই বাড়ি—ব্যাঙ্গালোরের ফ্রেজার টাউনের এভারগ্রিন লজ—এখনও আছে কি? আর সেখানে এখনও সন্ধ্যাকালে সাইমন সাহেবের ভূতের আগমন হয় কি? আর সে ভূত কি অচেনা লোককে দেখা দেয়? আমি যদি সে-বাড়িতে গিয়ে একটা সন্ধ্যা কাটাই—তা হলে সাইমনের ভূতকে দেখতে পাব কি?

ব্যাঙ্গালোরে এসে প্রথম দিন অনীককে এসব কিছুই বলিনি। সে আমাকে তার অ্যাম্বাসাডর গাড়িতে করে সমস্ত ব্যাঙ্গালোর শহর ঘুরিয়ে দেখিয়েছে—এমনকী ফ্রেজার টাউনও। ব্যাঙ্গালোর সত্যিই সুন্দর জায়গা, তাই শহরটা সম্বন্ধে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে আমার কোনও মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়নি। শুধু সুন্দর নয়—কলকাতার পর এমন একটা শান্ত কোলাহলশূন্য শহরকে প্রায় একটা অবাস্তব স্বপ্নরাজ্যের মতো মনে হয়।

দ্বিতীয় দিন ছিল রবিবার। সকালে অনীকের বাগানে রঙিন ছাতার তলায় বসে চা খেতে খেতে প্রথম ব্রাউন সাহেবের প্রসঙ্গটা তুললাম। ও শুনেটুনে হাত থেকে চায়ের

পেয়ালা নামিয়ে বেতের টেবিলের উপর রেখে বলল, 'দ্যাখ রঞ্জন—যে বাড়ির কথা বলছিস সে বাড়ি হয়তো থাকলেও থাকতে পারে, একশো বছর আর এমন কী বেশি। তবে সেখানে গিয়ে যদি ভূতটুত দেখার লোভ থেকে থাকে তোর, তা হলে আমি ওর মধ্যে নেই। কিছু মনে করিসনি ভাই—আমি চিরকালই একটু অতিরিক্ত সেন্‌সিটিভ। এমনি দিব্যি আছি—আজকের দিনের শহরের কোনও উপদ্রব নেই এখানে—ভূতের পিছনে ছোটা মানে সাধ করে উপদ্রব ডেকে আনা। ওর মধ্যে আমি নেই!'

অনীকের কথা শুনে বুঝলাম এই বারো বছরে ও বিশেষ বদলায়নি। ইস্কুলে ভিতু বলে ওর বদনাম ছিল বটে। মনে পড়ল একবার আমাদের ক্লাসেরই জয়ন্ত আর আরো কয়েকটি ডানপিটে ছেলে ওকে এক সন্ধ্যায় বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের রাইডিং স্কুলের কাছটাতে আপাদমস্তক সাদা কাপড় মুড়ি দিয়ে ভয় দেখিয়েছিল। অনীক এই ঘটনার পর দু'দিন ইস্কুলে আসেনি, এবং অনীকের বাবা নিজে হেডমাস্টার বীরেশ্বরবাবুর কাছে এসে ব্যাপারটা নিয়ে কমপ্লেন করেছিলেন।

আমি এ বিষয়ে কিছু বলার আগেই অনীক হঠাৎ বলে উঠল, 'তবে নেহাতই যদি তোর যেতে হয়, তা হলে সঙ্গীর অভাব হবে না। আসুন মিস্টার ব্যানার্জি।'

পিছন ফিরে দেখি একটি বছর পঁয়তাল্লিশের ভদ্রলোক অনীকের বাগানের গেট দিয়ে ঢুকে হাসিমুখে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। বেশ বলিষ্ঠ চেহারা, প্রায় ছ' ফুট হাইট, পরনে ছাই রঙের হ্যান্ডলুমের প্যান্টের উপর গাঢ় নীল টেরিলিনের বুশশার্টের গলায় সাদা-কালো বাটিকের ছোপ মারা সিল্কের মাফলার।

অনীক পরিচয় করিয়ে দিল, 'আমার বন্ধু রঞ্জন সেনগুপ্ত—মিস্টার হৃষীকেশ ব্যানার্জি।'

ভদ্রলোক শুনলাম ব্যাঙ্গালোরে এয়ারক্রাফট ফ্যাক্টরিতে কাজ করেন, বহুদিন বাংলাদেশ ছাড়া, তাই কথার মধ্যে একটা অবাঙালি টান এসে পড়েছে, আর অজস্র ইংরিজি শব্দ ব্যবহার করেন।

অনীক বেয়ারাকে ডেকে আর এক পেয়ালা চায়ের কথা বলে দিয়ে একেবারে সোজাসুজি ব্রাউন সাহেবের বাড়ির কথাটা পেড়ে বসল। কথাটা শুনে ভদ্রলোক এমন অট্টহাস্য করে উঠলেন যে, কিছুক্ষণ থেকে যে কাঠবিড়ালিটাকে দেখছিলাম আমাদের টেবিলের আশেপাশে নির্ভয়ে ঘোরাফেরা করছে, সেটা ল্যাজ উঁচিয়ে একটা দেবদারু গাছের গুঁড়ি বেয়ে সটান একেবারে মগডালে পৌঁছে গেল।

'গোস্টস? গোস্টস? ইউ সিরিয়াসলি বিলিভ ইন গোস্টস? আজকের দিনে? আজকের যুগে?'

আমি আমতা আমতা করে বললাম, 'একটা কৌতূহল থাকতে ক্ষতি কি? এমনও তো হতে পারে যে, ভূতেরও একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে, যেটা দশ বছরের মধ্যে জানা যাবে।'

ব্যানার্জির হাসি তবুও থামে না। লক্ষ করলাম ভদ্রলোকের দাঁতগুলো ভারী ঝকঝকে ও মজবুত।

অনীক বলল, 'যাই হোক মিস্টার ব্যানার্জি—গোস্ট অর নো গোস্ট—এমন বাড়ি

যদি একটা থেকেই থাকে, আর রঞ্জনের যদি একটা উদ্ভট খেয়াল হয়েই থাকে—একটা সন্ধেবেলা ওকে নিয়ে খানিকটা সময়ের জন্য ও বাড়িতে কাটিয়ে আসতে পারেন কি না সেইটে বলুন। ও কলকাতা থেকে এসেছে, আমার গেস্ট—ওকে তো আর আমি একা যেতে দিতে পারি না সেখানে। আর সত্যি বলতে কী—আমি নিজে মানুষটা একটু অতিরিক্ত, যাকে বলে, সাবধানী। আমি যদি নিয়ে যাই তা হলে বোধহয় ওর সুবিধের চেয়ে অসুবিধেই হবে বেশি।'

মিস্টার ব্যানার্জি তাঁর শার্টের পকেট থেকে একটা বাঁকা পাইপ বার করে তার মধ্যে তামাক গুঁজতে গুঁজতে বললেন, 'আমার আপত্তি নেই—তবে আমি যেতে পারি কেবল একটা কন্ডিশনে—আমি সঙ্গে শুধু একজনকে নেব না, দু'জনকেই নেব।'

কথাটা শেষ করে ব্যানার্জি আবার হাসলেন, আর তার ফলে এবার আশেপাশের গাছ থেকে চার-পাঁচরকম পাখির চিৎকার ও ডানা-ঝাপটানির আওয়াজ শোনা গেল। অনীকের মুখ কিঞ্চিৎ ফ্যাকাসে দেখালেও, সে আপত্তি করতে পারল না।

'কী নাম বললেন বাড়িটার?' ব্যানার্জি জিজ্ঞেস করলেন।

'এভারগ্রিন লজ।'

'ফ্রেজার টাউনে?'

'তাই তো বলছে ডায়রিতে।'

'হুঁ...' ভদ্রলোক পাইপে টান দিলেন। 'ফ্রেজার টাউনে সাহেবদের কিছু পুরনো বাড়ি আছে বটে, কটেজ টাইপের। এনিওয়ে—যেতেই যদি হয় তো দেরি করে লাভ কী? হোয়াট অ্যাবাউট আজ বিকেল? এই ধরুন চারটে নাগাদ?'

ইঞ্জিনিয়ার হলে কী হবে—মেজাজটা একেবারে পুরোদস্তুর মিলিটারি এবং সাহেবি। ঘড়ি ধরে চারটের সময় হৃষীকেশ ব্যানার্জি তাঁর মরিস মাইনর গাড়িটি নিয়ে হাজির। গাড়িতে যখন উঠছি তখন ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, 'সঙ্গে কী কী নিলেন?'

অনীক ফিরিস্তি দিল—একটা পাঁচসেলের টর্চ, ছ'টা মোমবাতি, ফার্স্ট-এড বক্স, একটা বড় ফ্লাস্ক ভর্তি গরম কফি, এক বাক্স হ্যাম স্যান্ডউইচ, এক প্যাকেট তাস, মাটিতে পাতবার চাদর, মশা তাড়ানোর জন্য এক টিউব ওডোমস।

'আর অস্ত্রশস্ত্র?' ব্যানার্জি জিজ্ঞেস করলেন।

'ভূতকে কি অস্ত্র দিয়ে কিছু করা যায়? কীরে রঞ্জন—তোর সাইমনের ভূত কি সলিড নাকি?'

'যাই হোক,' মিস্টার ব্যানার্জি গাড়ির দরজা বন্ধ করে বললেন, 'আমার কাছে একটি ছোটখাটো আগ্নেয়াস্ত্র আছে, সুতরাং সলিড-লিকুইড নিয়ে চিন্তা করার কোনও প্রয়োজন নেই।'

গাড়ি ছাড়ার পর ব্যানার্জি বললেন, 'এভারগ্রিন লজের ব্যাপারটা একেবারে কাল্পনিক নয়।'

আমি একটু অবাক হয়েই বললাম, 'আপনি কি এর মধ্যেই খোঁজ নিয়েছেন নাকি?'

ব্যানার্জি রীতিমতো কসরতের সঙ্গে দুটো সাইকেল চালককে পর পর পাশ কাটিয়ে বললেন, 'আই অ্যাম এ ভেরি মেথডিক্যাল ম্যান, মিস্টার সেনগুপ্ত। যেখানে যাচ্ছি, সে জায়গাটা অ্যাট অল আছে কি না সেটার সম্বন্ধে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রাখা উচিত নয় কি? ও দিকটায় শ্রীনিবাস দেশমুখ থাকে—আমরা একসঙ্গে গল্‌ফ খেলি—অনেকদিনের আলাপ। সকালে এখান থেকে ওর বাড়িতেই গেসলাম। বলল এভারগ্রিন লজ বলে একটা একতলা কটেজ নাকি প্রায় পঞ্চাশ বছর থেকে খালি পড়ে আছে। বাড়ির বাইরের বাগানে বছর দশেক আগে পর্যন্ত লোকে পিকনিক করতে যেত, এখন আর যায় না। খুব নিরিবিলি জায়গায় বাড়িটা। আগেও নাকি একটানা বেশিদিন কেউ ও বাড়িতে থাকেনি। তবে হন্টেড হাউস বলে কেউ কোনওদিন অপবাদ দেয়নি বাড়িটার। বাড়ির ফার্নিচার সব বহুদিন আগেই নিলাম হয়ে গেছে। তার কিছু নাকি কর্নেল মার্সারের বাড়িতে আছে। রিটায়ার্ড আর্মি অফিসার। তিনিও ফ্রেজার টাউনেই থাকতেন। সব শুনেটুনে, বুঝেছেন মিস্টার সেনগুপ্ত, মনে হচ্ছে আমাদেরও এই পিকনিক জাতীয়ই একটা কিছু করে ফেরত আসতে হবে। অনীকেন্দ্র তাসটা এনে ভালই করেছে।'

ব্যাঙ্গালোরের পরিষ্কার প্রশস্ত রাস্তা দিয়ে গাড়ি করে যেতে যেতে বারবারই মনে হচ্ছিল যে শহরটা এতই অভুতুড়ে যে, এখানে একটা হানাবাড়ির অস্তিত্বই কল্পনা করাই কঠিন।

কিন্তু তার পরেই আবার মনে পড়ে যাচ্ছিল ব্রাউন সাহেবের ডায়রির কথা। লোকে নেহাত পাগল না হলে ডায়রিতে আজগুবি কথা বানিয়ে লিখবে কেন? সাইমনের ভূত ব্রাউন নিজে দেখেছেন। একবার নয়, অনেকবার। সে ভূত কি আমাদের জন্য একবার দেখা দেবে না?

বিলেতে আমি যাইনি, কিন্তু বিলেতের কটেজের ছবি বইয়ের পাতায় ঢের দেখেছি। এভারগ্রিন লজের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হল সত্যিই যেন ইংল্যান্ডের কোনও গ্রামাঞ্চলের একটা পুরনো পরিত্যক্ত বাড়ির সামনে এসে পড়েছি।

কটেজের সামনেই ছিল বাগান। সেখানে ফুলের কেয়ারির বদলে এখন শুধু ঘাস আর আগাছা। একটা ছোট্ট কাঠের গেট (যাকে ইংরেজিতে বলে wicket) দিয়ে বাগানে ঢুকতে হয়। সেই গেটের গায়ে একটা ফলকে খোদাই করে এখনও লেখা রয়েছে বাড়ির নামটা। তবে হয়তো কোনও চড়ুইভাতির দলেরই কেউ রসিকতা করে এভারগ্রিন কথাটার আগে একটা N জুড়ে দিয়ে সেটাকে নেভারগ্রিন করে দিয়েছে।

আমরা গেট দিয়ে ঢুকে বাড়ির দিকে এগোলাম। চারিদিকে অজস্র গাছপালা। ইউক্যালিপটাসও গোটা তিনেক রয়েছে দেখলাম। আর যা গাছ আছে তার অনেকগুলোরই নাম আমার জানা নেই, চোখেও দেখিনি এর আগে কোনওদিন। ব্যাঙ্গালোরের জলমাটির নাকি এমনই গুণ যে, সেখানে যে-কোনও দেশের যে-কোনও গাছই বেঁচে থাকে।

কটেজের সামনে একটা টালির ছাউনি দেওয়া পোর্টিকো, তার বাঁকা থামগুলো

বেয়ে লতা উঠেছে ওপর দিকে। ছাউনির অনেক টালিই নেই, ফলে ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখা যায়। সামনের দরজার একটা পাল্লা ভেঙে কাত হয়ে আছে। বাড়ির সামনের দিকের দরজা-জানলার কাচ অধিকাংশই ভাঙা। দেয়ালের ওপর শেওলা ধরে এমন অবস্থা হয়েছে যে বাড়ির আসল রংটা যে কী ছিল তা আজ বোঝার উপায় নেই।

দরজা দিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকলাম আমরা।

ঢুকেই একটা প্যাসেজ। পিছন দিকে একটা ভাঙা দরজার ভিতর দিয়ে একটা ঘর দেখা যাচ্ছে। আমাদের ডাইনে-বাঁয়েও ঘর। ডাইনেরটাই বেশি বড় বলে মনে হল। আন্দাজে বুঝলাম এটাই হয়তো বৈঠকখানা ছিল। মেঝেতে বিলিতি কায়দায় কাঠের তক্তা বসানো—তার কোনওটাই প্রায় আস্ত নেই। সাবধানে পা ফেলতে হয়, এবং প্রতি পদক্ষেপে খুটখাট খচখচ শব্দ থাকে।

আমরা ঘরটাতে ঢুকলাম।

বেশ বড় ঘর, ফার্নিচার না থাকাতে আরো খাঁ খাঁ করছে। পশ্চিম আর উত্তর দিকে জানলার সারি। একদিকের জানলা দিয়ে গেট সমেত বাগান, আর অন্যদিক দিয়ে গাছের সারি দেখা যাচ্ছে। এরই একটাতে কি বাজ পড়েছিল? সাইমন দাঁড়িয়েছিল সেই গাছের নীচে। তৎক্ষণাৎ মৃত্যু। ভাবতে গা-টা ছমছম করে উঠল।

এবারে দক্ষিণদিকের জানলাবিহীন দেয়ালের দিকে চাইলাম। বাঁ কোণে ফায়ারপ্লেস। এই ফায়ারপ্লেসের পাশেই ছিল সাইমনের প্রিয় চেয়ারখানা।

ঘরের সিলিং-এর দিকে চাইতে চোখে পড়ল ঝুল আর মাকড়সার জাল। এককালে সুদৃশ্য এভারগ্রিন লজের অবস্থা এখন খুবই শোচনীয়।

মিস্টার ব্যানার্জি প্রথমদিকে লা লা করে বিলিতি সুর ভাঁজছিলেন, এখন নতুন করে পাইপ ধরিয়ে বললেন, 'কী খেলা আসে আপনাদের? ব্রিজ, না পোকার, না রামি?'

অনীক হাতের জিনিসপত্র মেঝেতে সাজিয়ে চাদরটা বিছিয়ে মাটিতে বসতে যাচ্ছিল, এমন সময় একটা শব্দ কানে এল।

অন্য কোনও ঘরে কেউ জুতো পায়ে হাঁটছে।

অনীকের দিকে চেয়ে দেখলাম সে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

পায়ের শব্দটা থামল। মিস্টার ব্যানার্জি হঠাৎ মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে নিয়ে বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন—'ইজ এনিবডি দেয়ার?' সঙ্গে সঙ্গে আমরা তিনজনে প্যাসেজের দিকে এগোলাম। অনীক আলতো করে আমার কোটের আস্তিনটা ধরে নিয়েছে।

এবার জুতোর শব্দটা আবার শুরু হল। আমরা বাইরে প্যাসেজে গিয়ে পড়তেই ডানদিকের ঘরটা থেকে একটি ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে সামনে আমাদের দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। লোকটি ভারতীয়। মুখ ভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়িগোঁফ সত্ত্বেও ইনি যে ভদ্র এবং শিক্ষিত তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ভদ্রলোক বললেন, 'হ্যালো।'

আমরা কী বলব ঠিক বুঝতে পারছি না, এমন সময় আগন্তুক নিজেই আমাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করলেন।

'আমার নাম ভেঙ্কটেশ। আই অ্যাম এ পেন্টার। আপনারা কি এই বাড়ির মালিক না খদ্দের?'

ব্যানার্জি হেসে বললেন, 'দুটোর একটাও না। আমরা এমনি ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছি।'

'আই সি। আমি ভাবছিলাম এই বাড়িটা যদি পাওয়া যেত তা হলে আমার কাজের জন্য একটা স্টুডিও হতে পারত। ভাঙাচোরায় আমার আপত্তি নেই। মালিক কে জানেন না বোধহয়?'

'আজ্ঞে না। সরি।' ব্যানার্জি বললেন। 'তবে আপনি কর্নেল মার্সারের ওখানে খোঁজ করে দেখতে পারেন। সামনের রাস্তা ধরে বাঁদিকে চলে যাবেন। মিনিট পাঁচেকের হাঁটা পথ।'

'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে মিস্টার ভেঙ্কটেশ বেরিয়ে চলে গেলেন।

গেট খোলার এবং বন্ধ করার শব্দ পাবার পর ব্যানার্জি আবার তাঁর অট্টহাসি হেসে বললেন, 'মিস্টার সেনগুপ্ত, ইনি নিশ্চয়ই আপনার সাইমন বা ওই জাতীয় কোনও ভূতটুত নন!'

আমি হেসে বললাম, 'সবেমাত্র সোয়া পাঁচটা, এর মধ্যেই আপনি ভূতের আশা করেন কী করে? আর ইনি ভূত হলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর নিশ্চয়ই নন, কারণ তা হলে পোশাকটা অন্যরকম হত।'

আমরা ইতিমধ্যে বৈঠকখানায় ফিরে এসেছি। অনীক মাটিতে পাতা চাদরের উপর বসে পড়ে বলল, 'মিথ্যে কল্পনার প্রশ্রয় দিয়ে নার্ভাসনেস বাড়ানো! তার চেয়ে তাস হোক।'

'আগে মোমবাতি খানকতক জ্বালাও দেখি,' ব্যানার্জি বললেন, 'এখানে বড় ঝপ্ করে সন্ধে নামে।'

দুটো মোমবাতি জ্বালিয়ে কাঠের মেঝেতে দাঁড় করিয়ে ফ্লাস্কের ঢাকনিতে কফি ঢেলে তিনজনে পালা করে খেয়ে নিলাম। একটা কথা আমার কিছুক্ষণ থেকে মনে আসছিল সেটা আর না বলে পারলাম না। ভূতের নেশা যে আমার ঘাড়ে কীভাবে চেপেছে সেটা আমার এই কথা থেকেই বোঝা যাবে। ব্যানার্জিকে উদ্দেশ্য করে বললাম, 'আপনি বলেছিলেন কর্নেল মার্সার এ-বাড়ির ফার্নিচার কিছু কিনেছিলেন। তিনি যদি এতই কাছে থাকেন তা হলে তাঁর বাড়িতে গিয়ে একটা জিনিসের খোঁজ করে আসা যায় কি?'

'কী জিনিস?' ব্যানার্জি প্রশ্ন করলেন।

'একটা বিশেষ ধরনের হাই-ব্যাক্ড চেয়ার।'

অনীক যেন একটু বিরক্ত হয়েই বললে, 'কেন বল তো? হঠাৎ এখন হাই-ব্যাক্ড চেয়ারের খোঁজ করে কী হবে?'

'না, মানে, ব্রাউন সাহেব বলেছেন ওটা নাকি সাইমনের খুব প্রিয় চেয়ার ছিল। সে ভূত হয়েও ওটাতে এসে বসত। ওটা থাকত ওই ফায়ারপ্লেসটার পাশে। হয়তো ওটা ওখানে এনে রাখতে পারলে—'

অনীক বাধা দিয়ে বলল, 'তুই ব্যানার্জি সাহেবের ওই মরিস গাড়িতে করে হাই-ব্যাক্ড চেয়ার নিয়ে আসবি না কি আমরা তিনজনে ওটাকে কাঁধে করে আনব? তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে?'

ব্যানার্জি এবার হাত তুলে আমাদের দু'জনকেই থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'কর্নেল মার্সার যা কিনেছেন তার মধ্যে ওরকম চেয়ার নেই এটা আমি জানি। তাঁর বাড়িতে আমার যথেষ্ট যাতায়াত আছে। ওটা থাকলে আমার চোখে পড়ত। আমি যতদূর জানি উনি কিনেছিলেন দুটো বেক কেস, দুটো অয়েল পেন্টিং, খানকতক ফুলদানি, আর শেলফে সাজিয়ে রাখার জন্য গুটিকতক শখের জিনিস, যাকে আর্ট অবজেক্টস বলে।'

আমি দমে গেলাম। অনীক তাস বার করে সাফল করতে আরম্ভ করেছে। ব্যানার্জি বললেন, 'রামিই হোক। আর এসব খেলা জমে ভাল যদি পয়সা দিয়ে খেলা যায়। আপনাদের আপত্তি আছে কি?'

বললাম, 'মোটেই না। তবে আমি ব্যাঙ্কের সামান্য চাকুরে, বেশি হারাবার সামর্থ্য আমার নেই।'

বাইরে দিনের আলো ম্লান হয়ে এসেছে। আমরা খেলায় মন দিলাম। আমার তাসের ভাগ্য কোনওদিনই ভাল না। আজও তার ব্যতিক্রম লক্ষ করলাম না। আমি জানি অনীক মনে মনে নার্ভাস হয়ে আছে, সুতরাং সে জিতলে পরে আমি অন্তত একটু নিশ্চিন্ত হতাম, কিন্তু তারও কোনও লক্ষণ দেখলাম না। কপাল ভাল একমাত্র মিস্টার ব্যানার্জির। গুনগুন করে বিলিতি সুর ভাঁজছেন, আর দানের পর দান জিতে চলেছেন। খেলতে খেলতে নিস্তব্ধতার মধ্যে একবার একটা বেড়ালের ডাক শুনলাম। তার ফলে আমার মনটা আরো যেন একটু দমে গেল। হানাবাড়িতে বেড়ালেরও থাকা উচিত নয়। কথাটা বলাতে ব্যানার্জি হেসে বললেন, 'বাট ইট ওয়াজ এ ব্ল্যাক ক্যাট—ওই প্যাসেজ দিয়ে হেঁটে গেল। ব্ল্যাক ক্যাট তো ভূতের সঙ্গে যায় ভালই—তাই না?'

খেলা চলতে থাকল। বেশ কিছুক্ষণের জন্য একবার মাত্র একটা অজানা পাখির কর্কশ ডাক ছাড়া আর কোনও শব্দ, দৃশ্য বা ঘটনা আমাদের একাগ্রতায় বাধা পড়তে দেয়নি।

ঘড়িতে সাড়ে ছ'টা, বাইরের আলো নেই বললেই চলে, আমি একটু ভাল তাস পেয়ে পর পর দু'বার জিতেছি, আর এক রাউন্ড রামি হয়ে গেছে ইতিমধ্যে, এমন সময় হঠাৎ একটা অস্বাভাবিক শব্দ কানে এল।

কে যেন বাইরের দরজায় টোকা মারছে।

আমাদের তিনজনেরই হাস তাসসুদ্ধ নীচে নেমে এল।

টক্ টক্ টক্ টক্।

অনীক এবার আরো ফ্যাকাশে। আমার বুকের ভিতরেও মৃদু কম্পন শুরু হয়েছে। কিন্তু ব্যানার্জি দেখলাম সত্যিই ঘাবড়াবার লোক নন। হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভেদ করে তাঁর বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'হু ইজ ইট?'

আবার দরজায় টোকা—টক্ টক্ টক্।

ব্যানার্জি তদন্ত করার জন্য তড়াক করে উঠে পড়লেন। আমি খপ করে

ভদ্রলোকের প্যান্টটা ধরে চাপা গলায় বললাম, 'একা যাবেন না।'

তিনজনে একসঙ্গে ঘর থেকে বেরোলাম। প্যাসেজে এসে বাঁদিকে চাইতেই দেখলাম দরজার বাইরে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে—তার পরনে সুট ও হাতে একটা লাঠি। অন্ধকারে তাকে চেনার কোনও উপায় নেই। অনীক আবার আমার আস্তিন চেপে ধরল। এবার আরো জোরে। ওর অবস্থা দেখেই বোধহয় আমার মনে আপনা থেকেই একটা সাহসের ভাব এল।

ব্যানার্জি ইতিমধ্যে আরো কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ও-হ্যালো, ডক্টর লার্কিন! আপনি এখানে?'

এবার আমিও প্রৌঢ় সাহেবটিকে বেশ ভালভাবেই দেখতে পেলাম। অমায়িক সাহেবটি তাঁর সোনার চশমার পিছনে নীল চোখ দুটোকে কুঁচকে হেসে বললেন, 'তোমার মরিস গাড়িখানা দেখলাম বাইরে। তারপর দেখি বাড়ির জানলা দিয়ে মোমবাতির আলো দেখা যাচ্ছে। তাই ভাবলাম একবার ঢুঁ মেরে দেখে যাই তুমি কী পাগলামি করছ এই পোড়ো বাড়ির ভেতর।'

ব্যানার্জি হেসে বললেন, 'আমার এই যুবক বন্ধু দুটির একটু উদ্ভট ধরনের অ্যাডভেঞ্চারের শখ। বলল এভারগ্রিন লজে বসে তাস খেলবে, তাই আর কী!'

'ভেরি গুড, ভেরি গুড! যুবা বয়সটাই তো এ-ধরনের পাগলামির সময়। আমরা বুড়োরাই কেবল নিজেদের বাড়ির কৌচে বসে রোমন্থন করি। ওয়েল ওয়েল—হ্যাভ এ গুড টাইম!'

লার্কিন সাহেব হাত তুলে গুডবাই করে লাঠি ঠক্ ঠক্ করতে করতে চলে গেলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয়বার ভূতের আশা পরিত্যাগ করতে হল। কী আর করি, আবার তাসে মনোনিবেশ করলাম। প্রথমদিকে প্রায় সাড়ে চার টাকার মতো হারছিলাম, গত আধঘণ্টায় তার খানিকটা ফিরে পেয়েছি। সাইমনের ভূত না দেখলেও, শেষ পর্যন্ত তাসে কিছু জিতে বাড়ি ফিরতে পারলেও আজকের আউটিংটা কিছুটা সার্থক হয়।

ঘড়ির দিকে মাঝে মাঝেই চোখটা চলে যাচ্ছিল। আসল ঘটনাটা কখন ঘটেছিল তার টাইম আমার জানা আছে। ব্রাউন সাহেবের ডায়রি থেকে জেনেছিলাম যে সন্ধ্যার এই সময়টাতেই বাজ পড়ে সাইমনের মৃত্যু হয়।

আমি তাস বাঁটছি, মিস্টার ব্যানার্জি তাঁর পাইপে আগুন ধরাচ্ছেন, অনীক সবেমাত্র স্যান্ডউইচ খাবার মতলবে প্যাকেটটাতে হাত লাগিয়েছে, এমন সময় তার চোখের চাহনিটা মুহূর্তের মধ্যে বদলে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আড়ষ্ট হয়ে গেল।

তার দৃষ্টি দরজার বাইরে প্যাসেজের দিকে। বাকি দু'জনের চোখও স্বভাবতই সেদিকে চলে গেল। যা দেখলাম তাতে আমারও কয়েক মুহূর্তের জন্য গলা শুকিয়ে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল।

বাইরে প্যাসেজের অন্ধকারের মধ্যে একজোড়া জ্বলন্ত চোখ আমাদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। ফসফরাসের মতো ফিকে সবুজ আর হলদে মেশানো একটা আভা এই নিষ্পলক চাহনিতে।

মিস্টার ব্যানার্জির ডানহাতটা ধীরে ধীরে তাঁর কোটের ভেস্ট পকেটের দিকে চলে

গেল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই যেন ম্যাজিকের মতো আমার কাছে ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গিয়ে আমার মন থেকে সমস্ত ভয় দূর করে দিল। বললাম, 'আপনার পিস্তলের দরকার নেই মশাই—এটা সেই কালো বেড়ালটা।'

আমার কথায় অনীকও যেন ভরসা পেল। ব্যানার্জি পকেট থেকে তাঁর হাত বার করে এনে চাপা গলায় বললেন, 'হাউ রিডিকুলাস!'

এবার জ্বলন্ত চোখ দুটো আমাদের ঘরের দিকে এগিয়ে এল। চৌকাঠ পেরোতেই মোমবাতির আলোতে প্রমাণ হল আমার কথা। এটা সেই কালো বেড়ালটাই বটে। চৌকাঠ পেরিয়ে বেড়ালটা বাঁদিকে ঘুরল। আমাদের দৃষ্টি তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে, তাকে অনুসরণ করছে।

এবারে আমাদের তিনজনের গলা দিয়ে একসঙ্গে একটা শব্দ বেরিয়ে পড়ল। আচমকা বিস্ময়ের ফলে যে-শব্দ আপনা থেকেই মানুষের মুখ থেকে বেরোয়—এ সেই শব্দ। এই শব্দের কারণ আর কিছুই না—আমরা যতক্ষণ তন্ময় হয়ে তাস খেলেছি তারই ফাঁকে কীভাবে কোত্থেকে জানি একটা গাঢ় লাল মখমলে মোড়া হাই-ব্যাক্‌ড চেয়ার এসে ফায়ার প্লেসের পাশে তার জায়গা করে নিয়েছে।

অমাবস্যার রাতের অন্ধকারের মতো কালো বেড়ালটা চেয়ারটার দিকে নিঃশব্দে এগিয়ে গেল। তারপর এক মুহূর্ত সেটার সামনে দাঁড়িয়ে একটা নিঃশব্দ লাফে সেটার ওপর উঠে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ল। আর সেই মুহূর্তে একটা অদ্ভুত শব্দ শুনে আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। কোনও এক অশরীরী বৃদ্ধের খিলখিলে হাসির ফাঁকে ফাঁকে বারবার উচ্চারিত হচ্ছে—"সাইমন সাইমন সাইমন সাইমন"—আর তার সঙ্গে ছেলেমানুষি খুশি হওয়া হাততালি।

একটা আর্তনাদ শুনে বুঝলাম অনীক অজ্ঞান হয়ে গেছে। আর মিস্টার ব্যানার্জি? তিনি অনীককে কোলপাঁজা করে তুলে ঊর্ধ্বশ্বাসে প্যাসেজ দিয়ে দরজার দিকে ছুটছেন।

আমিও আর থাকতে পারলাম না। তাস মোমবাতি ফ্লাস্ক চাদর স্যান্ডউইচ সব পড়ে রইল। দরজা পেরিয়ে মাঠ, মাঠ পেরিয়ে গেট, গেট পেরিয়ে ব্যানার্জির মরিস মাইনর।

ভাগ্যে ব্যাঙ্গালোরের রাস্তায় লোক চলাচল কম, নইলে আজ একটিমাত্র পাগলা গাড়ির পাগলা ছুটে ক'টা লোক যে জখম হতে পারত তা ভাবলেও গায়ে কাঁটা দেয়।

অনীকের জ্ঞান গাড়িতেই ফিরে এসেছিল, কিন্তু তার মুখে কোনও কথা নেই। প্রথম কথা বললেন মিস্টার ব্যানার্জি। অনীকের বেয়ারার হাত থেকে ব্র্যান্ডির গেলাসটা ছিনিয়ে নিয়ে এক ঢোকে অর্ধেকটা নামিয়ে দিয়ে ঘড়ঘড়ে চাপা গলায় বলে উঠলেন, 'সো সাইমন ওয়াজ এ ক্যাট!'

আমার নিজেরও কিছুই বলার অবস্থা নেই, কিন্তু আমার মন তাঁর কথায় সায় দিল।

সত্যিই, ব্রাউন সাহেবের বুদ্ধিমান, খামখেয়ালি, অভিমানী, অনুগত, আদরের সাইমন—যার মৃত্যু হয় বজ্রাঘাতে আজ থেকে একশো তেরো বছর আগে—সেই সাইমন ছিল আমাদের আজকের দেখা একটি পোষা কালো বেড়াল!